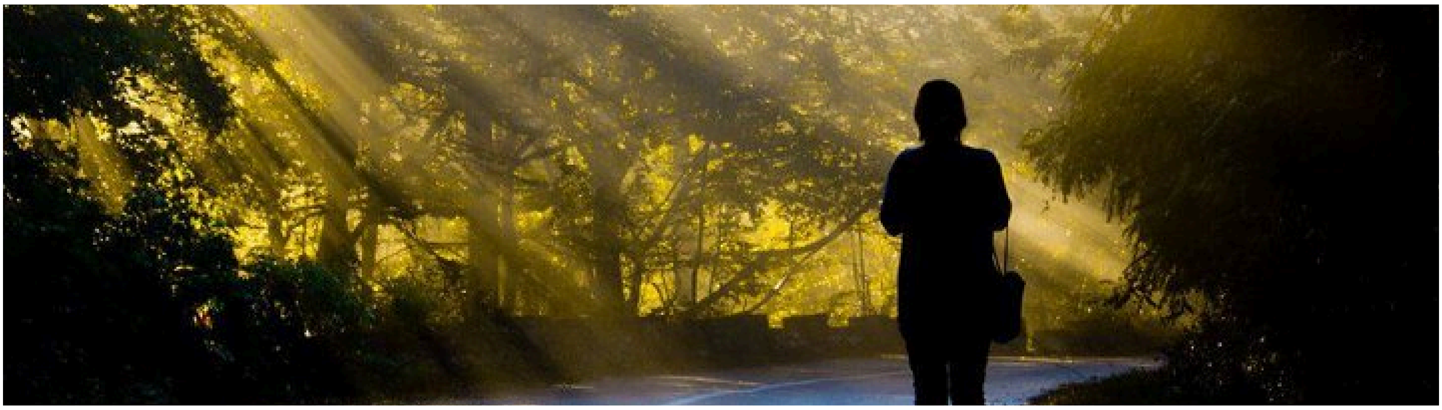

মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ (পর্ব-৩)

ইউসুফ আল কারাদাওয়ী

দ্বিতীয় পর্বঃ মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ

আমি আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

ক. মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হবে। মাতাপিতা, ভাইবোন, কারো সাথেই এই অজুহাতে কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না যে, তারা ধর্মের সীমালংঘন করছে। তারা যদি এরূপ করেও তবুও তাদের সম্মান-স্নেহ পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে : "তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।" (৩১ : ১৫)।

অনুরূপভাবে পিতা ইবরাহীম (আ)-এর আচরণ থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কুরআনে এর বর্ণনা আছে। পিতাকে সত্য পথে আনার জন্যে তিনি পিতার রূঢ়তা সত্ত্বেও তাকে কোমলতার সাথে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাহলে মুসলমান পিতামাতাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে?

খ. সকল মানুষ এক, ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। কিন্তু এ সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য আছে। তার মধ্যে বয়স একটি। এজন্যে শিষ্টতা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, শাসকের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যুবক সম্মান করবে বৃদ্ধকে, ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। যেমন: "বৃদ্ধ মুসলমানের প্রতি সম্মান আল্লাহর গৌরব।" (আবু দাউদ) এবং "যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ, বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান ও জ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আমার (উম্মতভুক্ত) নয়।" (আহমদ, তাবরানী, হাকিম)

গ. যারা দাওয়াতী কাজে অভিজ্ঞ, এক সময় খুব সক্রিয় ছিলেন, কোনো কারণে এখন ঝিমিয়ে পড়েছেন তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের অবদানের কথা ভুলে গিয়ে তাদের নিন্দা মুখর হওয়া উচিত নয়। এটাও রাসূল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ। হাতিব ইবনে আবু বালতাহ (রা)-এর ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে খবর সরবরাহের বিনিময়ে মক্কায় অবস্থিত তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষার অনুরোধ করে পৌত্তলিক কুরায়েশদের কাছে বার্তা পাঠান। বার্তাটি ধরা পড়লে হাতির স্বীকার করেন। তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) তার বিশ্বাসঘাতকতায় এতোই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তিনি তার শিরচ্ছেদ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, "তুমি কিভাবে জানো, আল্লাহ সম্ভবত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ভাল কাজ দেখেছেন এবং তাদেরকে বলেছেনঃ "তোমরা যা খুশী তাই করো। কেননা আমি মাফ করে দিয়েছি তোমাদেরকে (তোমাদের অতীত-ভবিষ্যতের পাপকে)।" প্রাথমিক যুগে হাতিবের ইসলাম গ্রহণ, বদরের যুদ্ধে তার শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করলেন। এভাবে তিনি বদরের যোদ্ধাদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কেও সকলকে সচেতন করে দিলেন।

ঘ. আমি মুসলিম তরুণদেরকে দিবাস্বপ্ন ও অবাস্তব ভাববাদিতা পরিহার করার উপদেশ দিচ্ছি। তাদেরকে ধূলোর

ধরণীতে নেমে বড় বড় শহরে বস্তি ও গ্রামের নিপীড়িত মানুষের সাথে মিশতে হবে। এখানেই নির্ভেজাল পুণ্য, সরলতা ও পবিত্রতার উৎস নিহিত আছে। এসব মানুষ অভাবের তীক্ষ্ণ খোঁচায় দিশেহারা হয় না। এখানে সমাজ পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও আন্দোলনের বিপুল উপাদান ছড়িয়ে আছে। এদের সাথে মেলামেশা করে তাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে এবং তাদের খারাপ দিকগুলো বর্জন ও সুকৃতির বিকাশে উদ্যোগী হতে হবে। এজন্যে সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রয়াস চাই। নিপীড়িতদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা এবং তাদেরকে সঠিক পথে এনে জিহাদের কাতারে শামিল করার প্রচেষ্টাও ইবাদাহর মধ্যে গণ্য। ইসলামে দাতব্য কাজে উৎসাহ দেয়া হয়, এটি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত।

আবু হুরায়রাহ (রা) একটি হাদীসে বলেন : মানুষের প্রতিটি সন্ধির জন্যে সাদাকাহ তার কাছ থেকে প্রাপ্য, প্রতিদিন যখন সূর্য ওঠে। দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দেয়াও সাদাকাহ, পশুর পিঠে চড়তে কাউকে সাহায্য করা অথবা মাল তুলে দেয়াও সাদাকাহর অন্তর্ভূক্ত এবং একটি মধুর বচনও সাদাকা এবং কল্যাণের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সাদাকাহ, পথ থেকে ক্ষতিকর জিনিস সরানোও সাদাকাহ। (সকল প্রামাণ্য সূত্রে সমর্থিত)

ইবনে আব্বাস (রা) আরেকটি হাদীসে বলেন, প্রতিদিন একটি মানুষের প্রতিটি সন্ধির জন্যে তার কাছ থেকে একটি ভাল কাজ প্রাপ্য। শ্রোতাদের একজন বলল, এটা আমাদের জন্যে খুবই কঠিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের ভাল কাজের আদেশ, খারাপ ও অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বারণ একটি সালাহ, দরিদ্রের জন্যে সাহায্য একটি সালাহ, রাস্তা থেকে ময়লা সরানোরও একটি সালাহ ও সালাহর পথে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সালাহ। (ইবনে খুজায়মা)

বুরায়দা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মানুষের ৩৬০টি অস্থি-সন্ধি আছে। তাকে অবশ্যই প্রতিটির জন্যে সাদাকাহ দিতে হবে। তারা (সাহাবীরা) বললেন, হে নবী, এটা কার পক্ষে সম্ভব? তারা মনে করেছিলেন যে, এটা অর্থনৈতিক সাদাকাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, মসজিদে শ্লেষ্মার ওপরে কেউ যদি মাটি চাপা দেয় তাও সাদাকাহ, পথ থেকে বাধা সরানোও সাদাকাহ। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হাব্বান)

এ রকম তথ্য আরো বহু হাদীসে আছে। অন্ধ, বোবা, দুর্বলের ও দুস্থের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ রয়েছে এবং এসব কাজকে সাদাকাহ ও ইবাদাহ বলে গণ্য করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলমান সর্বদা পুণ্য কাজের উৎস হিসেবে বিরাজমান। এভাবে অন্যেরও উপকার করছে, নিজের মধ্যেও সদগুণের বিকাশ ঘটাচ্ছে, সেই সাথে অসৎবৃত্তি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সেই ব্যক্তি রহমতপ্রাপ্ত যাকে আল্লাহ সৎকর্মের চাবি এবং অসৎকর্মের তালা বানিয়েছেন। (ইবনে মাজা)

অবশ্য অনেক ভাববাদী মনে করতে পারেন এতে দাওয়াতী কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি মনে করি সামাজিক সম্পর্কটাই একটা বাস্তব দাওয়াহ। এই দাওয়াহ মানুষ আপন পরিবেশে পেয়ে থাকে। ইসলাম কেবল বুলি নয়। দাওয়াহ অর্থ মানুষের সমস্যার সাথে একাত্ম হওয়া, এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। ইমাম হাসান আল বান্নাহ (র) এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন বলে ইসলামী আন্দোলনের সমাজ সেবা বিভাগ খুলেছিলেন সর্বত্র। তিনি মনে করতেন মুসলমানকে যেমন সালাতের মাধ্যমে ইবাদতের তাগিদ দেয়া হয়েছে : হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকাজ কর যাতে সফলকাম হতে পার এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। (২২ : ৭৭-৭৮)

উপরিউক্ত আয়াত মুসলিম জীবনের ত্রিমুখী ভূমিকার সংজ্ঞা দিয়েছে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ইবাদতের মাধ্যমে তার সেবা; সামাজিক ভূমিকা হচ্ছে দাতব্য কাজের মাধ্যমে সমাজের সেবা; বাতিল শক্তির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালানো। এরপরেও হয়তো ভাববাদীরা আগে ভাগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাই বলবে এই যুক্তিতে যে, এটা হয়ে গেলে তো সব সমস্যারই সমাধান অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তো সমগ্র উম্মাহর দায়িত্ব। এজন্যে তো সময় ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। এই প্রিয়তম উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তো আমাদেরকে সমাজের সেবা ও উন্নতির চেষ্টাও করতে হবে। এই তৎপরতা একাধারে ভবিষ্যত বংশধরদের গঠন, প্রস্তুতি ও উম্মাকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতারও পরীক্ষা। এটা হচ্ছে এই রকম যে, একজনের এক্ষুণি চিকিৎসা দরকার, কিন্তু একজন ইসলামী ডাক্তার ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী হাসপাতাল ছাড়া রোগীর চিকিৎসা করতে নারাজ। অতএব ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সমাজ বা মানবতার সেবা কিংবা কোনো বিতর্কিত বিষয়ের

মীমাংসা স্থগিত রাখার যুক্তি হাস্যকর।

পক্ষান্তরে মুসলমানের আসল কর্তব্য যেভাবে হোক, যতটুকু হোক, সাধ্য মতো অন্যায়-অনাচারের উৎপাটনে ও সৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। কুরআন বলছে : তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর। (৬৪ : ১৬)

কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে আমার ধারণা: একটি জলপাই ও খেজুর গাছের বাগান ফল উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নেয়। এর অর্থ কি এই যে বাগানের মালিক আর কোনো উৎপাদনমুখী কাজের চেষ্টা না করে জলপাই ও খেজুর ফলনের আশায় বসে থাকবে, এটা কি যুক্তিসঙ্গত? তাকে জীবিকার্জনের জন্যে অন্য কাজও করতে হবে, সেই সাথে কাঙ্খিত ফলের জন্যে জলপাই ও খেজুর গাছেরও যত্ন নিতে হবে।

৬. তরুণদের প্রতি আমার সর্বশেষ পিতৃ স্নেহসুলভ উপদেশ হচ্ছে : হতাশার শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করুন এবং মুসলমানদের মধ্যে নির্মল ও সচ্চরিত্রের নমুনা হোন। অবশ্য এই আশাবাদের জন্যে আরো কয়েকটি বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি দিতে হবে:

প্রথম : মানুষ ফেরেশতা নয়। পিতা আদম (আ)-এর মতো তারাও ভুল করতে পারে। আল-কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, আমি তো আগেই আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (২০ : ১১৫)

মানুষের ভ্রান্তি প্রবণতা ও প্রবৃত্তির প্রতি প্রলোভন স্বীকার করে নিলে আমরা অন্যের ভুল ত্রুটির প্রতি সহনীয় ও সহৃদয় মনোভাব পোষণের পাশাপাশি তাদেরকে আল্লাহ ক্রোধ ও শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে পারবো এবং তার প্রতি আল্লাহর ক্ষমারও আশা করতে পারব। আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলছেন : বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৯ : ৫৩)

উক্ত আয়াতে আমার বান্দা বলার মাধ্যমে বান্দাদের জন্যে আল্লাহর উদ্বেগ ও দয়ার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় : এটা বোঝা আবশ্যক যে, মানুষের মনের গহীনে কী আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ আর জানেন না। অতএব তার বক্তব্যের আলোকে তাকে বিচার করতে হবে। তাই কেউ যদি কালিমা পাঠ করে তাহলে তাকে মুসলমান হিসেবেই গণ্য করা উচিত। এটাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ। তিনি বলেন আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি (আল্লাহর দ্বারা) সেই সব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যতোক্ষন না তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল এবং সুচারুরূপে নামায পড়বে, যাকাত দেবে। তারা সকলে যদি এরূপ করে তারা আমার কাছ থেকে (ইসলামী আইনপ্রদত্ত শাস্তির বিধান ব্যতীত) জীবন ও সমাজ রক্ষা করে এবং আল্লাহ্ তাদের হিসাব নেবেন।

এ কারণেই তিনি মুনাফিকুনকে শাস্তি দেননি অথচ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তাদেরকে হত্যা করার পরামর্শ এলে তিনি বলেন: আমি ভয় করি লোকে বলবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর সাহাবীদের হত্যা করে।

তৃতীয় : আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস করে, সে যতো খারাপ করুক একেবারেই জন্মগতভাবে ভালোশূন্য হতে পারে না। বড় ধরনের পাপ করলে সে একেবারে ঈমানশূন্য হয়ে যায় না যতোক্ষণ না সে ইচ্ছাকৃত আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁর আদেশ অবজ্ঞা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) পাপাচারীকে চিকিৎসার দৃষ্টিতে দেখতেন যেমন রোগীকে দেখা হয়। পুলিশের মতো তিনি অপরাধীকে দেখতেন না। ইনশাআল্লাহ্ নিচের ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে:

একজন কোরায়শী যুবক একদিন রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে ব্যভিচারের অনুমতি চাইল। সাহাবীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি যুবকটিকে তার আরো কাছে আসতে বললেন। তারপর বললেন,তুমি কি তোমার মায়ের জন্যে এটা (ব্যভিচার) মেনে নেবে? যুবকটি জবাব দিল, না। রাসূল্লাহ (সা) বললেন, (অন্য) লোকেরাও তাদের মায়েদের জন্যে এটা অনুমোদন করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বারবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে তার কন্যা, বোন ও চাচীর জন্যে এটা অনুমোদন করবে না। তারপর তিনি যুবকটির হাত ধরে বললেন, আল্লাহ্ তার (তরুণের) পাপ মার্জনা করুন, তার অন্তর পবিত্র করুন এবং তাকে সহিষ্ণু করুন (তার এই কামনার বিরুদ্ধে)। (আহমদ, তাবারানী) এই সহৃদয় অনুভূতি সুস্পষ্ট সদিচ্ছা ও মানুষের জন্মগত সুমতির প্রতি আস্থার পরিচায়ক যা

মানুষের খারাপ বৃত্তিগুলোকে বিদূরিত করতে সক্ষম। আর খারাপ প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তিনি ধৈর্যের ও যুক্তির সাথে তার সাথে আলাপ করে তার ভুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। চরমপন্থীরা যুক্তি দেখাতে পারে যে, যুবকটি যেহেতু ব্যভিচার করেনি তাই তার প্রতি উদারতা দেখানো হয়েছে। তাহলে আরো একটি উদাহরণ দেখা যাক: এক মহিলা ব্যভিচারিণী গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা)-এর কাছে এসে দোষ স্বীকার করে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে পাপমুক্ত করার জন্যে বারবার চাপ দিতে লাগলো। তাকে পাথর মারার সময় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তাকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, “খালিদ নম্র হও। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, সে এমন অনুশোচনা করেছে যে, এমনকি একজন দোষী খাজনা আদায়কারীও যদি অনুতপ্ত হতো তবে তাকেও ক্ষমা করা হতো।” (মুসলিম ও অন্যান্য)

কেউ কেউ যুক্তি দেখাবেন মহিলাটি পাপ করেই অনুতাপ করেছে। তাহলে আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় একজন মদ্যপায়ীকে বার বার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আনা হলো এবং বার বার তাকে শাস্তি দেয়া হলো, কিন্তু সে নেশা করতেই থাকলো। একদিন যখন তাকে একই অভিযোগে আবার হাযির করে তাকে বেত্রাঘাত করা হলো তখন এক ব্যক্তি বললো, “আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন! কতোবার তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আনা হলো?” রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “তাকে অভিশাপ দিও না, আল্লাহর শপথ, আমি জানি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে।” রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, “তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।” রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে অভিশাপ দেয়া থেকে বারণ করলেন এ কারণে যে, এতে ঐ মানুষটি এবং তার মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও রেষারেষি সৃষ্টি করতে পারে কারণ-তার পাপ তাকে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। উপরিউক্ত ঘটনাবলি গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে, মানুষের অন্তর্নিহিত সুকৃতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। অতএব যেসব চরমপন্থী কেউ ভুল করলেই তাকে নির্বিচারে কুফর-শিরকের ফতোয়া দেয়, তা তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একদা বলেছিলেন : “অন্ধকারকে অভিশাপ দেয়ার পরিবর্তে রাস্তায় একটি মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করো।”

এই হচ্ছে আমার প্রিয় তরুণ মুসলমানদের প্রতি উপদেশ। আমার উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হযরত শুয়াইব (আ)-এর ভাষায়: “আমি আমার সাধ্য মতো সংস্কার করতে চাই। আল্লাহর মদদেই কিন্তু কাজসম্পন্ন হয়; আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।” (১১: ৮৮)

উৎসঃ ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা - ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী

প্রথম পর্বঃ মুসলিম তরুণদের প্রতি উপদেশ

ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী

প্রফেসর ড. ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত ও কুশলী। ইসলামী জ্ঞানে তাঁর গভীরতা এবং সমসাময়িক বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের কি ভূমিকা হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামতের জন্য তিনি সারা বিশ্বে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংলাপের উপর তিনি সব সময় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত ড. ক্বারাদাওয়ীর জন্ম ১৯২৬ সালে। দশ বছর বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ কুরআন হেফজ করেন এবং কুরআন তেলাওয়াতের নীতিমালা, তাজবীদের উপর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি আল আজহারেই পড়ালেখা করেন। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূল আল দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ড. ক্বারাদাওয়ী আল আজহার ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময়ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আল্লামা বা মহান পণ্ডিত খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৫৮ সালে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর ডিপ্লোমা করেন। এর আগে তিনি আরবী ভাষা অনুষদ থেকে শিক্ষকতার সনদ পান।

ড. ক্বারাদাওয়ী মিশর সরকারের আওকাফ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বোর্ড অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স-এর একজন সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি আলজেরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ইসলামিক সায়েন্টিফিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমী, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামীর ফিকাহ একাডেমী, রয়াল একাডেমী ফর ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ জর্ডান, ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সদস্য, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ-এর প্রেসিডেন্ট এবং কাতার সীরাহ স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক। তিনি বাংলাদেশস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য।

তাঁর এ পর্যন্ত ৪২টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি, তুর্কী, ফার্সী, উর্দু, ইন্দোনেশিয়া সহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ বইটি সহ মোট ৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে “ইসলামে হালাল-হারামের বিধান”, “ইসলামের যাকাত বিধান”, “ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন” বই তিনটি খায়রুন প্রকাশনী প্রকাশ করেছে। এছাড়া নতুন সফর প্রকাশনী, ঢাকা “আধুনিক যুগ, ইসলাম, কৌশল ও কর্মসূচি” এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, চট্টগ্রাম “দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম” প্রকাশ করেছে। ড. ক্বারাদাওয়ীর ইংরেজি ভাষায় অনূদিত www.qardawi.net/english বই ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।

তিনি একজন স্বনামধন্য কবি। নিজস্ব কাব্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি আরব বিশ্বে সুপরিচিত। বর্তমানে ড. ক্বারাদাওয়ী আল জাজিরাহ টেলিভিশনে একটি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। বিশ্বের কোটি কোটি দর্শক শ্রোতা এ অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলামের একজন সক্রিয় কর্মী। এর জন্য তাঁকে ১৯৪৯, ১৯৫৪-১৯৫৬ এবং ১৯৬৫ সালে কারাবরণ করতে হয়। আরব ও মুসলিম দেশ সমূহের প্রতি পাশ্চাত্য বিশ্বের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতির জন্য তিনি তাদের একজন কঠোর সমালোচক। একই সাথে ফিলিস্তিন প্রশ্নে ইসরাঈলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ, একপেশে ও নিঃশর্ত সমর্থনের তিনি তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেন। ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে তার সাম্প্রতিক বক্তব্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগণের মতামতকে শাণিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। তিনি একজন মানবাধিকারের প্রবক্তা। নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের সপক্ষে তিনি সোচ্চার যা তার বিভিন্ন লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ড. ক্বারাদাওয়ী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আরব ও মুসলিম দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছেন।